أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.68) www.motaher21.net

كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ

"আল্লাহর সাহায্যকারী হও, বিজয় তোমাদের!"

"Be my helpers, ones that prevail !"

সুরা: আস-সফ

আয়াত নং :-14

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। ঠিক তেমনি, যখন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেনঃ আল্লাহর দিকে (আহবান করার ক্ষেত্রে) কে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীরা জবাব দিয়েছিলোঃ আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। সেই সময় বনী ইসরাঈল জাতির একটি দল ঈমান আনয়ন করেছল এবং আরেকটি দল অস্বীকার করেছিল। অতঃপর আমি ঈমান আনয়নকারীদেরকে তাদের শত্রুদিগের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম এবং তারাই বিজয়ী হয়ে গেল।

১৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

حَوَارِيّٖنَ শব্দটি حَوَارِي এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। ঈসা আলাইহিস সালাম এর অনুসারীদেরকে ‘হাওয়ারী’ বলা হত। [ইবন কাসীর]

এই আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে উত্থিত হওয়ার পর নাসারারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল বলল, তিনি ইলাহ ছিলেন এবং আসমানে চলে গেছেন। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি ইলাহ ছিলেন না বরং ইলাহর পুত্র ছিলেন। এখন আল্লাহ তাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শত্রুদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলল। তারা বলল, “তিনি ইলাহও ছিলেন না, ইলাহর পুত্রও ছিলেন না; বরং আল্লাহর দাস ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্যে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।' মূলত: এরাই ছিল সত্যিকার ঈমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপক্রম হয়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফের দল মুমিনদের মোকাবিলায় প্রবল হয়ে ওঠে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেন। তিনি মুমিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মুমিন দল যুক্তি প্রমাণের নিরীখে বিজয়ী হয়ে যায়। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতে উল্লেখিত الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বা “যারা ঈমান এনেছে” বলে ঈসা আলাইহিসসালাম-এর উম্মতের মুমিনগণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহায্য ও সমর্থনে বিজয়ের গৌরব অর্জন করবে। সে হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদী যারা রাসূলের প্রকৃত অনুসারী তারা সর্বদা বিজয়ী থাকবে। [দেখুন: তাফসীরে তাবারী: ২৮/৬০, দ্বিয়া আল-মাকদেসী: আল-মুখতারাহ: ১০/৩৭৬-২৭৮, নং ৪০২]

হযরত ঈসা (আ) সঙ্গীদের জন্য বাইবেলে সাধারণত ‘শিষ্য’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে খৃস্টানদের মধ্যে তাদের জন্য রসূলحوارى পরিভাষাটি চালু হয়। তবে তারা আল্লাহর রসূল ছিল এ অর্থে তাদেরকে রসূল বলা হতো না, বরং তাদেরকে রসূল বলা হতো এ অর্থে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে মুবাল্লিগ হিসেবে পাঠাতেন। যেসব লোককে হাইকলের জন্য চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো তাদের জন্য এ শব্দটির ব্যবহার ইহুদীদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ছিল। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদে এর পরিবর্তে হাওয়ারী পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যা এ দু'টি খৃষ্টীয় পরিভাষা থেকে উত্তম। এ শব্দটির মূল হলো حور যার অর্থ শুভ্রতা। ধোপাকে হাওয়ারী বলা হয়। এ জন্য যে, সে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ও সাদা করে দেয়। খাঁটি ও নিখাদ জিনিসকেও হাওয়ারী বলা হয়। চালুনি দিয়ে চেলে যে আটার ভূষি ও ছাল বের করে আলাদা করা হয়েছে তাকে حوارى (হাওয়ারা) বলে। এ অর্থে অকৃত্রিম বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সাহায্যকারীকে বুঝাতে ও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ইবনে সাইয়েদ বলেনঃ যেসব

ব্যক্তি কাউকে অধিক মাত্রায় সাহায্য করে তাকেও ঐ ব্যক্তির হাওয়ারী বলে। (লিসানুল আরব)।

☆ কুরআন মজিদের অন্যান্য যায়গার মত এখানেও সেসব লোকদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী নামে অভিহিত করা হয়েছে যারা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানায় এবং কুফরীর মুকাবেলায় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায়। আল ইমরান ৫২, হজ্জ-৪০, মুহাম্মদ -৭, হাদীদ - ২৫ ও হাশর-৮ আয়াতে একই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে যখন সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকুলের উপর অনির্ভরশীল, মুখেপেক্ষীহীন, সকলেই তাঁর উপর নির্ভরশীল ও তাঁর মুখাপেক্ষী, তখন কোন বান্দার পক্ষে তাঁর সাহায্যকারী হওয়া কিরূপে সম্ভব? নিম্নে এর কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে ঃ

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কোন কাজের ব্যাপারে তাঁর কোন বান্দাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সেই লোকদেরকে সেই কারণে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে- মূলতই একথা সত্য নহে। বস্তুত জীবনের যে যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নিজে মানুষকে কুফর ও ঈমান, আল্লাহনুগত্য ও নাফরমানী করার স্বাধীনতা দান করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা জবরদস্তিমূলকভাবে তাদেরকে ঈমানদার ও অনুগত বানান না। বরং তাঁর নবী রাসূল ও নিজের প্রেরিত কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে সত্য দ্বীনের পথে পরিচালিত করার জন্য উপদেশ নসীহত শিক্ষাদান, ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করেন। এই উপদেশ নসিহত, শিক্ষাদান, বুঝানোকে যে লোক নিজের সন্তুষ্টি ইচ্ছা ও আগ্রহে কবুল করে সে মুমিন। যে লোক কার্যত অনুগত হয় সে মুসলিম,

আবেদ ও কানেত। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে সে মুত্তাকী। যে লোক নেক আমল সমূহের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় সে মুহসিন। আর এসব হতেও এক কদম সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যে লোক এই শিক্ষাদান ও উপদেশ নসীহতের সাহায্যে আল্লাহর বান্দাহগনের সংশোধন বিধানের জন্য এবং কুফর ও ফাসিকীর(বিরুদ্ধে) পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ করতে শুরু করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা "আনসারুল্লাহ" তথা নিজের সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই সাহায্যদানের তাৎপর্য নিশ্চয়ই এটা নহে যে, এই লোকেরা আল্লাহর নিজের এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করছেন। যা তিনি পূরণ করতে পারেননা বলে এদের উপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছেন। বরং এটা এই অর্থে যে এই লোকেরা সেই কাজে অংশগ্রহণ করে যে কাজ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তির সাহায্যে করার পরিবর্তে নিজের নবী, রাসূল ও আসমানী কিতাব সমূহ ও তার অনুসারীদের সাহায্যে সুসম্পন্ন করতে চান।

হাওয়ারী অর্থ আন্তরিক বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সমর্থক, সাহায্যকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারো চূড়ান্ত পর্যায়ের সাহায্য সহযোগিতা করে সে তার হাওয়ারী। যারা ঈসা (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে সর্বাবস্থায় সংগ দেয়ার এবং সাহায্য করার অংগীকার করেছিল কুরআন তাদেরকে হাওয়ারী বলে অভিহিত করেছে।

বনী ইসরাইলের একদল লোক যারা সত্যের প্রতি নিবেদিত ছিল তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু অধিকাংশ ছিল কঠিন হৃদয়ের এবং তারা তাদের মিথ্যা অহংকার ও গোত্র প্রীতিতে লিপ্ত ছিল। অধিকাংশ লোকের এদলই প্রথমত বিজয়ী বলে মনে হচ্ছিল যখন তারা মনে করেছিল যে ঈসা (আঃ)কে তারা ক্রসে বিদ্ধ করে তাঁর দাওয়াতকে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু তারা অচিরেই হুশে ফিরে আসল এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। খ্রীষ্টীয় ৭০ অব্দে জেরুজালেম টাইটাস কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যায় এবং এরপর থেকেই ইহুদীরা চিরকালের জন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অপর পক্ষে ঈসা (আঃ) এর উপর ইমান আনয়নকারীরা রোমান সম্রাজ্যের সাথে মিলিত হয়ে অনেক গোত্র এবং জাতিকে নিজেদের অনুসারী করে তোলে এবং ইসলাম ধর্ম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্টান ধর্মই প্রধান ধর্ম হিসেবে বিরাজিত ছিল।

অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যদি সত্যাশ্রয়ী হয় তারা অবশ্যই বিজয়ী থাকবে। বদর যুদ্ধে, খন্দক যুদ্ধে মুশরেক ও তাদের

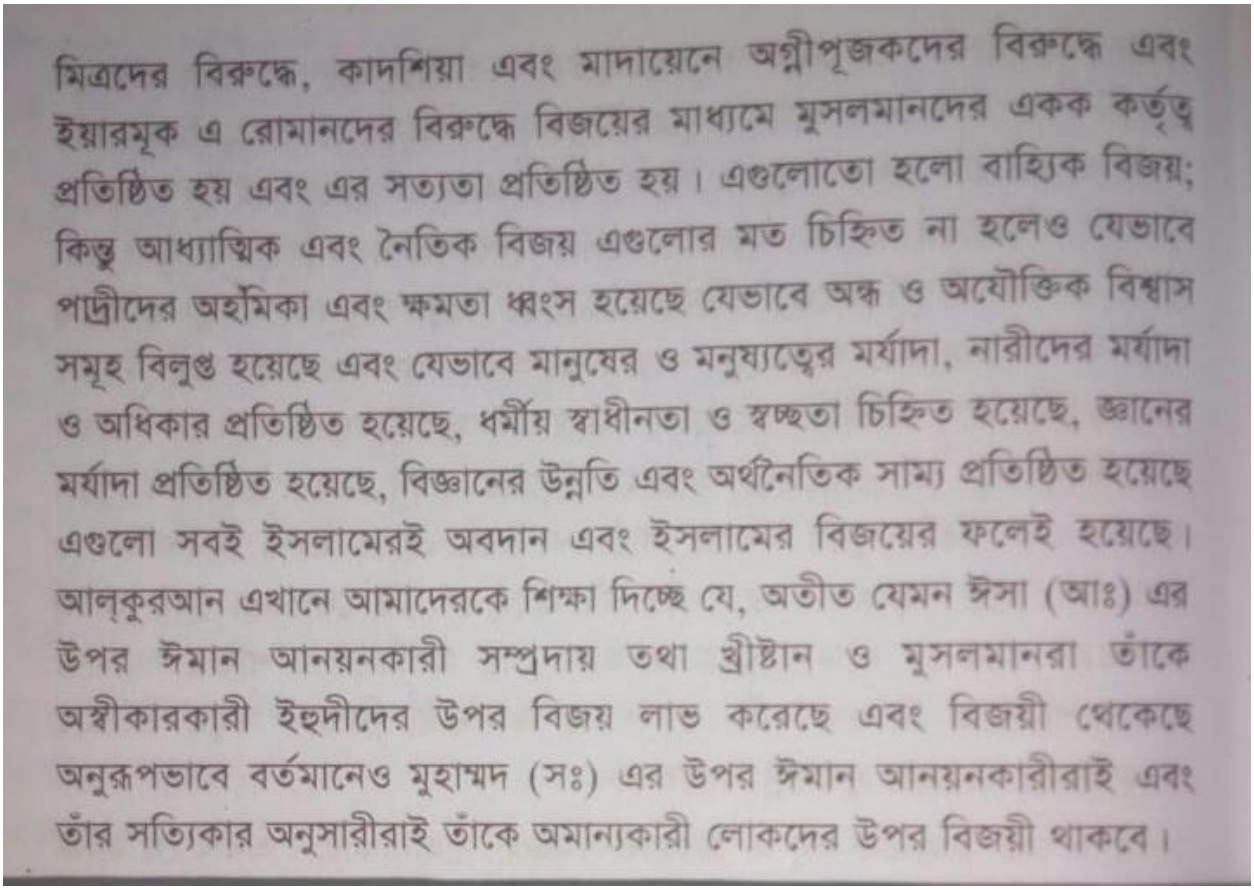

মিত্রদের বিরুদ্ধে, কাদশিয়া এবং মাদায়েনে অগ্নীপূজকদের বিরুদ্ধে এবং ইয়ারমূক এ রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোতো হলো বাহ্যিক বিজয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিজয় এগুলোর মত চিহ্নিত না হলেও যেভাবে পাদ্রীদের অহমিকা এবং ক্ষমতা ধ্বংস হয়েছে যেভাবে অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাস সমূহ বিলুপ্ত হয়েছে এবং যেভাবে মানুষের ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা, নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা চিহ্নিত হয়েছে, জ্ঞানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলো সবই ইসলামেরই অবদান এবং ইসলামের বিজয়ের ফলেই হয়েছে। আল্‌কুরআন এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, অতীত যেমন ঈসা (আঃ) এর উপর ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায় তথা খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা তাঁকে অস্বীকারকারী ইহুদীদের উপর বিজয় লাভ করেছে এবং বিজয়ী থেকেছে অনুরূপভাবে বর্তমানেও মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর ঈমান আনয়নকারীরাই এবং তাঁর সত্যিকার অনুসারীরাই তাঁকে অমান্যকারী লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে।

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-৫২

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

যখন ঈসা অনুভব করলো, ইসরাঈল কুফরী ও অস্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছে, সে বললোঃ "কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বললোঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম (আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্যের শির নতকারী) ।

তাফসীর :

'হাওয়ারী' শব্দটি আমাদের এখানে 'আনসার' শব্দের কাছাকাছি অর্থ বহন করে। বাইবেলে সাধারণভাবে হাওয়ারীর পরিবর্তে 'শিষ্যবৃন্দ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাদের 'রসূল'ও বলা হয়েছে। কিন্তু

রসূল এই অর্থে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে দ্বীন প্রচারের জন্য পাঠাতেন। আল্লাহ তাদেরকে রসূল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, এই অর্থে রসূল বলা হয়নি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণকে কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে "আল্লাহ্‌কে সাহায্য করা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অবশ্যি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়। জীবনের যে পরিসরে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দান করেছেন সেখানেই তিনি নিজের খোদায়ী শক্তি ব্যবহার করে কুফর বা ঈমান, বিদ্রোহ বা আনুগত্যের মধ্য থেকে কোন একটির পথ অবলম্বন করার জন্য মানুষকে বাধ্য করেননি। এর পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও উপদেশের সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে তিনি মানুষের কাছ থেকে এই স্বতস্ফূর্ত স্বীকৃতি আদায় রতে চেয়েছেন যে, অস্বীকৃতি, নাফরমানী ও বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা থাকা সত্বেও তার জন্য নিজের স্রষ্টার দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করাই প্রকৃত সত্য এবং এটিই তার সাফল্য ও নাজাতের পথ। এভাবে প্রচার, উপদেশ ও নসীহতের সাহায্যে মানুষকে সত্য সঠিক পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করাই আল্লাহর কাজ। আর যেসব লোক এই কাজে আল্লাহকে সাহায্য করে তাদেরকেই আল্লাহর সাহায্যকারী গণ্য করা হয়। আল্লাহর কাছে মানুষের এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা। নামায, রোযা এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগীতে মানুষ নিছক বান্দা ও গোলামদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাহায্যকারী ও সহযোগীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই দুনিয়ার রুহানী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে অভিষিক্ত হবার এটিই উচ্চতম মর্যাদা ও মকাম।

সুরা: আল-হাজ্জ

আয়াত নং :-৪০

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের রব।" যদি আল্লাহ লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশী করে উচ্চারণ করা হয় সেসব আশ্রমে, গীর্জা, ইবাদাতখানা ও মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।

তাফসীর :

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা হজ্জের এ অংশটি অবশ্যই হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে।

এদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার করে বের করে দেয়া হয় তা অনুমান করার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা সামনে রাখতে হবেঃ

হযরত সোহাইব রুমী (রা.) যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশ বংশীয় কাফেররা তাঁকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছো। যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। কারো দান তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু ঐ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরনের কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) ও তাঁর স্বামী আবু সালামাহ (রা.) নিজেদের দুধের বাচ্চাটিকে নিয়ে হিজরত করার জন্য বের হয়ে পড়েন। বনী মুগীরাহ (উম্মে সালামাহর পরিবারের লোকেরা) তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারা আবু সালামাহকে বলে, তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো কিন্তু আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে পারো না। বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রীকে রেখে দিয়ে চলে যান। এরপর বনী আবদুল আসাদ (আবু সালামাহর বংশের লোকেরা) এগিয়ে আসে এবং তারা বলে, শিশুটি আমাদের গোত্রের। তাকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও। এভাবে মা ও বাপ উভয়ের কাছ থেকে শিশু সন্তানকেও ছিনিয়ে নেয়া হয়। প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) স্বামী ও সন্তানদের শোকে ছটফট করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বড়ই কঠিন বিপদের মধ্যদিয়ে নিজের শিশু সন্তানটি পুনরুদ্ধার করে মক্কা থেকে এমন অবস্থায় বের হয়ে পড়েন যে, একজন নিসঙ্গ স্ত্রীলোক কোলে একটি ছোট বাচ্চা নিয়ে উটের পিঠে বসে আছেন। এমন পথ দিয়ে তিনি চলছেন যেখান দিয়ে সশস্ত্র কাফেলা যেতে ভয় পেতো।

আইয়াশ ইবনে রাবীআহ আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। হযরত উমরের (রা.) সাথে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে যান। পিছে পিছে আবু জেহেল নিজের এক ভাইকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়। সে মায়ের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে, আম্মাজান কসম খেয়েছেন আইয়াশের চেহারা না দেখা পর্যন্ত রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না এবং মাথায় চিরুনীও লাগাবেন না। কাজেই তুমি গিয়ে একবার শুধু তাঁকে চেহারা দেখিয়ে দাও তারপর চলে এসো। তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মাতৃভক্তির আতিশয্যে তাদের সঙ্গ নেন। পথে দুই ভাই মিলে তাকে বন্দী করে এবং তাকে নিয়ে মক্কায় এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যখন তার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং দুই ভাই চিৎকার করে যাচ্ছিল, "হে মক্কাবাসীরা! নিজেদের নালায়েক ছেলেদেরকে

এমনিভাবে শায়েস্তা করো যেমন আমরা করেছি।” দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি বন্দী থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন দুঃসাহসী মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকেই এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও জালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি।

মূলে صَوَامِعُ ও بِيَعٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। صَلَوَاتٌ এমন জায়গাকে বলা হয় যেখানে খৃস্টান রাহেব যোগী, সন্ন্যাসী, সংসার বিরাগী সাধুরা থাকেন। صومعة শব্দটি আরবী ভাষায় খৃস্টানদের ইবাদাতগাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। بيعة শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের নামায পড়ার জায়গা। ইহুদীরা নিজেদের ভাষায় একে বলে صلوات “সালওয়াতা।” এটি আরামীয় ভাষার শব্দ। বিচিত্র নয় যে, ইংরেজী ভাষার (Salute ও Salutation) শব্দ এর থেকে বের হয়ে প্রথম ল্যাটিন ও পরে ইংরেজী ভাষায় পৌঁছে গেছে।

অর্থাৎ আল্লাহ কোন একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি, এটি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ায় একটি দলকে দিয়ে তিনি অন্য একটি দলকে প্রতিহত করতে থেকেছেন। নয়তো কোন এটি নির্দিষ্ট দল যদি কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করতো তাহলে শুধু দূর্গ, প্রাসাদ এবং রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস করে দেয়া হতো না বরং ইবাদাতগাহগুলোও বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতো না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুকে এভাবে বলা হয়েছেঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

“যদি আল্লাহ লোকদেরকে একজনের সাহায্যে অন্যজনকে প্রতিহত না করতে থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়।”

এ বক্তব্যটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং সত্য দ্বীন কায়েম ও মন্দের জায়গায় ভালোকে বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও

সংগ্রাম চালায় তারা আসলে আল্লাহর সাহায্যকারী। কারণ এটি আল্লাহর কাজ। এ কাজটি করার জন্য তারা আল্লাহর সাথে সহযোগিতা করে।

সুরা: মুহাম্মাদ

আয়াত নং :-৭

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দিবেন।

তাফসীর :

আল্লাহকে সাহায্য করার একটা সাদামাটা অর্থ হচ্ছে তার বাণী ও বিধানকে সমুন্নত করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করতে হবে। কিন্তু এর একটি গূঢ় দুর্বোধ্য অর্থও আছে।

সুরা: আল-হাদীদ

আয়াত নং :-২৫

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।

তাফসীর :

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে নবী-রসূলের মিশনের পুরা সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যত রসূল এসেছেন, তারা সবাই তিনটি বিষয় নিয়ে এসেছিলেনঃ

একঃ بينات অর্থাৎ স্পষ্ট নিদর্শনাবলী যা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছিলো যে, তাঁরা সত্যিই আল্লাহর রসূল। তাঁরা নিজেরা রসূল সেজে বসেননি। তাঁরা যা সত্য বলে পেশ করছেন তা সত্যিই সত্য আর যে জিনিসকে বাতিল বলে উল্লেখ করেন তা যে সত্যিই বাতিল তা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের পেশকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। সুস্পষ্ট হিদায়াতসমূহ, যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় ছাড়া বলে দেয়া হয়েছিল----আকায়েদ, আখলাক, ইবাতদ-বন্দেগী এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সঠিক পথ কি-- যা তারা অনুসরণ করবে এবং ভ্রান্ত পথসমূহ কি যা তারা বর্জন করবে।

দুইঃ কিতাব, মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব দিক নির্দেশনা এতে বর্তমান যাতে মানুষ পথনির্দেশনার জন্য তার স্মরণাপন্ন হতে পারে।

তিনঃ মিযান, অর্থাৎ হক ও বাতিলের মানদণ্ড যা দাঁড়ি পাল্লার মতই সঠিকভাবে ওজন করে বলে দিবে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক লেনদেনে প্রাচুর্য ও অপ্রতুলতার বিভিন্ন চরম পন্থার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কোন্টি।

নবী-রসূলদেরকে এ তিনটি জিনিস দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের আচরণ এবং মানব জীবনের বিধি-বিধান ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবেও যেন ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একদিকে প্রতিটি মানুষ তার আল্লাহর অধিকার, নিজের অধিকার এবং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অধিকার সঠিকভাবে জানবে এবং ইনসাফের কথা আদায় করবে যার সাথে কোন না কোনভাবে তাকে জড়িত হতে হয়। অপরদিকে সামাজিক জীবনের বিধি-বিধান এমন নীতিমালার ওপর নির্মাণ করতে হবে যাতে সমাজে কোন প্রকার জুলুম অবশিষ্ট না থাকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা পায়, সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগে সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সবাই যেন ইনসাফ মত যার যার অধিকার লাভ করে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। অন্য কথায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল নবী-রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য। তারা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব ছিলেন, যাতে তার মন-মগজ, তার চরিত্র অ কর্ম এবং তাঁর ব্যবহারের ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। তারা গোটা মানব সমাজেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন যাতে ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি উভয়েই পরস্পরের আত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ও সাংঘর্ষিক হওয়ার পরিবর্তে সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়।

লোহা নাযিল করার অর্থ মাটির অভ্যন্তরে লোহা সৃষ্টি করা। যেমন কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে:

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

তিনি তোমাদের জন্য গবাদী পশুর আটটি জোড়া নাযিল করেছেন। (আয যুমার ৬) । পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যায় তা যেহেতু আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়নি, আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসেছে। সুতরাং কুরআন মজীদে তা সৃষ্টি করাকে নাযিল করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী-রসূলদের মিশন কি তা বর্ণনা করার পর পরই আমি লোহা নাযিল করেছি, তার মধ্য বিপুল শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। বলায় আপনা থেকেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এখানে লোহা অর্থে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। বাক্যের প্রতিপাদ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু একটা পরিকল্পনা পেশ করার উদ্দেশ্যে রসূলদের পাঠান নাই। কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো ও সে উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করাও তাদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাতে এ প্রচেষ্টার ধ্বংস সাধনকারীদের শাস্তি দেয়া যায় এবং এর বিরুদ্ধে বাঁধা সৃষ্টিকারীদের শক্তি নির্মূল করা যায়।

অর্থাৎ আল্লাহ দুর্বল, তিনি আপন শক্তিতে এ কাজ করতে সক্ষম নন, তাই তাঁর সাহায্য প্রয়োজন, ব্যাপারটা তা নয়। তিনি মানুষকে পরীক্ষার জন্য এ কর্ম পন্থা গ্রহণ করেছেন। এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই মানুষ তার উন্নতি ও সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সব সময় এ ক্ষমতা আছে যে, যখন ইচ্ছা তিনি তাঁর একটি ইঙ্গিতেই সমস্ত কাফেরদের পরাস্ত করে তাদের ওপর তাঁর রসূলদের আধিপত্য দান করতে পারেন। কিন্তু তাতে রসূলদের ওপর ঈমান আনয়নকারীদের কি কৃতিত্ব থাকবে যে, তারা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? তাই আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে তাঁর বিজয়ী শক্তির সাহায্যে আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর রসূলদের 'বাইয়েনাত' স্পষ্ট নিদর্শনাদী, কিতাব ও মিযান দিয়ে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষের সামনে ন্যায়-নীতির বিধান পেশ করেন এবং জুলুম-নির্যাতন ও বে-ইনসাফী থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান। মানুষকে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, যার ইচ্ছা রসূলদের দাওয়াত কবুল করবে এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবে। যারা কবুল করলো তাদের আহবান জানিয়েছেন; এসো এই ন্যায় বিচারপূর্ণ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে আমার ও আমার রসূলদের সহযোগী হও এবং যারা জুলুম ও নির্যাতনমূলক বিধান টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করো। আল্লাহ তা'আলা এভাবে দেখতে চান, মানুষের মধ্যে কারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের বাণী প্রত্যাখ্যান করে আর কারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের মোকাবিলায় বে-ইনসাফী কায়েম রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ইনসাফের বাণী গ্রহণ করার পর তার সাহায্য-সহযোগিতা ও সে উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর কারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁরই কারণে এ ন্যায়

ও সত্যকে বিজয়ী করার জন্য প্রাণ-সম্পদও বাজি রাখছে। যার পরীক্ষায় সফল হবে, ভবিষ্যতে তাদের জন্যই বহুবিধ উন্নতির পথ খুলে যাবে।

সুরা: আল-হাশর

আয়াত নং :-৮

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَۚ

(তাছাড়াও এ সম্পদ) সেই সব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক।

তাফসীর :

এ কথা দ্বারা সেই সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঐ সময় মক্কা মুয়াযযামা ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনী নাযীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এসব মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব অর্থ-সম্পদ এখন হস্তগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হবে তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাথে সাথে এসব লোকেরও অধিকার আছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন সব লোকদের সহযোগিতা দেয়া উচিত যারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর দ্বীনের জন্য হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে এবং দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ ﷺ বনী নাযীরের সম্পদের একটি অংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং আনসারগণ যেসব খেজুর বাগান তাদের মুহাজির ভাইদের সাহায্যের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, 'ফাই' এর সম্পদে মুহাজিরদের এ অংশ কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে তাদের পুনর্বাসিত করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার উচিত যাকাত ছাড়া 'ফাই' এর সম্পদও এ খাতে খরচ করা।

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-৫২

فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِیْسٰی مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَی اللّٰهِؕ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِۚ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

যখন ঈসা অনুভব করলো, ইসরাঈল কুফরী ও অস্বীকার করতে উদ্যোগী হয়েছে, সে বললোঃ "কে হবে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বললোঃ আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম (আল্লাহ্‌র সামনে আনুগত্যের শির নতকারী)।

তাফসীর :

'হাওয়ারী' শব্দটি আমাদের এখানে 'আনসার' শব্দের কাছাকাছি অর্থ বহন করে। বাইবেলে সাধারণভাবে হাওয়ারীর পরিবর্তে 'শিষ্যবৃন্দ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাদের 'রসূল'ও বলা হয়েছে। কিন্তু রসূল এই অর্থে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে দ্বীন প্রচারের জন্য পাঠাতেন। আল্লাহ তাদেরকে রসূল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, এই অর্থে রসূল বলা হয়নি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণকে কুরআন মজীদের অধিকাংশ স্থানে "আল্লাহ্‌কে সাহায্য করা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অবশ্যি একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়। জীবনের যে পরিসরে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দান করেছেন সেখানেই তিনি নিজের খোদায়ী শক্তি ব্যবহার করে কুফর বা ঈমান, বিদ্রোহ বা আনুগত্যের মধ্য থেকে কোন একটির পথ অবলম্বন করার জন্য মানুষকে বাধ্য করেননি। এর পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও উপদেশের সাহায্য নিয়েছেন। এভাবে তিনি মানুষের কাছ থেকে এই স্বতষ্ফূর্ত স্বীকৃতি আদায় রতে চেয়েছেন যে, অস্বীকৃতি, নাফরমানী ও বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা থাকা সত্বেও তার জন্য নিজের স্রষ্টার দাসত্ব, আনুগত্য ও বন্দেগীর পথ অবলম্বন করাই প্রকৃত সত্য এবং এটিই তার সাফল্য ও নাজাতের পথ। এভাবে প্রচার, উপদেশ ও নসীহতের সাহায্যে মানুষকে সত্য সঠিক পথে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করাই আল্লাহর কাজ। আর যেসব লোক এই কাজে আল্লাহকে সাহায্য করে তাদেরকেই আল্লাহর সাহায্যকারী গণ্য করা হয়। আল্লাহর কাছে মানুষের এটিই সর্বোচ্চ মর্যাদা। নামায, রোযা এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগীতে মানুষ নিছক বান্দা ও গোলামদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমে সে আল্লাহর সাহায্যকারী ও সহযোগীর মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এই দুনিয়ার রূহানী ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিখরে অভিষিক্ত হবার এটিই উচ্চতম মর্যাদা ও মকাম।

সুরা: আল-হাজ্জ

আয়াত নং :-৪০

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

তাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা বলেছিল, "আল্লাহ আমাদের রব।" যদি আল্লাহ লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশী করে উচ্চারণ করা হয় সেসব আশ্রমে, গীর্জা, ইবাদাতখানা ও মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।

তাফসীর :

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা হজ্জের এ অংশটি অবশ্যই হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে।

এদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার করে বের করে দেয়া হয় তা অনুমান করার জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা সামনে রাখতে হবেঃ

হযরত সোহাইব রুমী (রা.) যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশ বংশীয় কাফেররা তাঁকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছো। যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছিলেন। কারো দান তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু ঐ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরনের কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) ও তাঁর স্বামী আবু সালামাহ (রা.) নিজেদের দুধের বাচ্চাটিকে নিয়ে হিজরত করার জন্য বের হয়ে পড়েন। বনী মুগীরাহ (উম্মে সালামাহর পরিবারের লোকেরা) তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। তারা আবু সালামাহকে বলে, তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো কিন্তু আমাদের মেয়েকে নিয়ে যেতে পারো না। বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রীকে রেখে দিয়ে চলে যান। এরপর বনী আবদুল আসাদ (আবু সালামাহর

বংশের লোকেরা) এগিয়ে আসে এবং তারা বলে, শিশুটি আমাদের গোত্রের। তাকে আমাদের কাছে দিয়ে দাও। এভাবে মা ও বাপ উভয়ের কাছ থেকে শিশু সন্তানকেও ছিনিয়ে নেয়া হয়। প্রায় এক বছর পর্যন্ত হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) স্বামী ও সন্তানদের শোকে ছটফট করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বড়ই কঠিন বিপদের মধ্যদিয়ে নিজের শিশু সন্তানটি পুনরুদ্ধার করে মক্কা থেকে এমন অবস্থায় বের হয়ে পড়েন যে, একজন নিসঙ্গ স্ত্রীলোক কোলে একটি ছোট বাচ্চা নিয়ে উটের পিঠে বসে আছেন। এমন পথ দিয়ে তিনি চলছেন যেখান দিয়ে সশস্ত্র কাফেলা যেতে ভয় পেতো।

আইয়াশ ইবনে রাবীআহ আবু জেহেলের বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। হযরত উমরের (রা.) সাথে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে যান। পিছে পিছে আবু জেহেল নিজের এক ভাইকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়। সে মায়ের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে, আম্মাজান কসম খেয়েছেন আইয়াশের চেহারা না দেখা পর্যন্ত রোদ থেকে ছায়ায় যাবেন না এবং মাথায় চিরুনীও লাগাবেন না। কাজেই তুমি গিয়ে একবার শুধু তাঁকে চেহারা দেখিয়ে দাও তারপর চলে এসো। তিনি মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও মাতৃভক্তির আতিশয্যে তাদের সঙ্গ নেন। পথে দুই ভাই মিলে তাকে বন্দী করে এবং তাকে নিয়ে মক্কায় এমন অবস্থায় প্রবেশ করে যখন তার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং দুই ভাই চিৎকার করে যাচ্ছিল, "হে মক্কাবাসীরা! নিজেদের নালায়েক ছেলেদেরকে এমনিভাবে শায়েস্তা করো যেমন আমরা করেছি।" দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি বন্দী থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন দুঃসাহসী মুসলমান তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকেই এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও জালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি।

মূলে صَوَامِعُ ও بِيَعٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। صَلَوَاتٌ এমন জায়গাকে বলা হয় যেখানে খৃস্টান রাহেব যোগী, সন্ন্যাসী, সংসার বিরাগী সাধুরা থাকেন। صومعة শব্দটি আরবী ভাষায় খৃস্টানদের ইবাদাতগাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। بيعة শব্দের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের নামায পড়ার জায়গা। ইহুদীরা নিজেদের ভাষায় একে বলে صلوات "সালওয়াতা।" এটি আরামীয় ভাষার শব্দ। বিচিত্র নয় যে, ইংরেজী ভাষার (Salute ও Salutation) শব্দ এর থেকে বের হয়ে প্রথম ল্যাটিন ও পরে ইংরেজী ভাষায় পৌঁছে গেছে।

অর্থাৎ আল্লাহ কোন একটি গোত্র বা জাতিকে স্থায়ী কর্তৃত্ব দান করেননি, এটি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ায় একটি দলকে দিয়ে তিনি অন্য একটি দলকে প্রতিহত করতে থেকেছেন। নয়তো কোন এটি নির্দিষ্ট দল যদি কোথাও স্থায়ী কর্তৃত্ব লাভ করতো তাহলে শুধু দূর্গ, প্রাসাদ এবং রাজনীতি, শিল্প ও

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস করে দেয়া হতো না বরং ইবাদাতগাহগুলোও বিধ্বস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতো না। সূরা বাকারায় এ বিষয়বস্তুকে এভাবে বলা হয়েছেঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

“যদি আল্লাহ লোকদেরকে একজনের সাহায্যে অন্যজনকে প্রতিহত না করতে থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের প্রতি বড়ই করুণাময়।”

এ বক্তব্যটি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করে এবং সত্য দ্বীন কায়েম ও মন্দের জায়গায় ভালোকে বিকশিত করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালায় তারা আসলে আল্লাহর সাহায্যকারী। কারণ এটি আল্লাহর কাজ। এ কাজটি করার জন্য তারা আল্লাহর সাথে সহযোগিতা করে।

সুরা: মুহাম্মাদ

আয়াত নং :-৭

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দিবেন।

তাফসীর :

আল্লাহকে সাহায্য করার একটা সাদামাটা অর্থ হচ্ছে তার বাণী ও বিধানকে সমুন্নত করার জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করতে হবে। কিন্তু এর একটি গূঢ় দুর্বোধ্য অর্থও আছে।

সুরা: আল-হাদীদ

আয়াত নং :-২৫

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।

তাফসীর :

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে নবী-রসূলের মিশনের পুরা সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যত রসূল এসেছেন, তারা সবাই তিনটি বিষয় নিয়ে এসেছিলেনঃ

একঃ بينات অর্থাৎ স্পষ্ট নিদর্শনাবলী যা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছিলো যে, তাঁরা সত্যিই আল্লাহর রসূল। তাঁরা নিজেরা রসূল সেজে বসেননি। তাঁরা যা সত্য বলে পেশ করছেন তা সত্যিই সত্য আর যে জিনিসকে বাতিল বলে উল্লেখ করেন তা যে সত্যিই বাতিল তা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের পেশকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। সুস্পষ্ট হিদায়াতসমূহ, যাতে কোন সন্দেহ-সংশয় ছাড়া বলে দেয়া হয়েছিল----আকায়েদ, আখলাক, ইবাতদ-বন্দেগী এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সঠিক পথ কি-- যা তারা অনুসরণ করবে এবং ভ্রান্ত পথসমূহ কি যা তারা বর্জন করবে।

দুইঃ কিতাব, মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব দিক নির্দেশনা এতে বর্তমান যাতে মানুষ পথনির্দেশনার জন্য তার স্মরণাপন্ন হতে পারে।

তিনঃ মিযান, অর্থাৎ হক ও বাতিলের মানদণ্ড যা দাঁড়ি পাল্লার মতই সঠিকভাবে ওজন করে বলে দিবে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক লেনদেনে প্রাচুর্য ও অপ্রতুলতার বিভিন্ন চরম পন্থার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কোন্টি।

নবী-রসূলদেরকে এ তিনটি জিনিস দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের আচরণ এবং মানব জীবনের বিধি-বিধান ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবেও যেন ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একদিকে প্রতিটি মানুষ তার আল্লাহর অধিকার, নিজের অধিকার এবং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অধিকার সঠিকভাবে জানবে এবং ইনসাফের কথা আদায় করবে যার সাথে কোন না কোনভাবে তাকে জড়িত হতে হয়। অপরদিকে সামাজিক জীবনের বিধি-বিধান এমন নীতিমালার ওপর নির্মাণ করতে হবে যাতে সমাজে কোন প্রকার জুলুম অবশিষ্ট না থাকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা পায়, সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগে সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সবাই যেন ইনসাফ মত যার যার অধিকার লাভ করে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। অন্য কথায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল নবী-রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য। তারা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব ছিলেন, যাতে তার মন-মগজ, তার চরিত্র অ কর্ম এবং তাঁর ব্যবহারের ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। তারা গোটা মানব সমাজেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন যাতে ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি উভয়েই পরস্পরের আত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ও সাংঘর্ষিক হওয়ার পরিবর্তে সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়।

লোহা নাযিল করার অর্থ মাটির অভ্যন্তরে লোহা সৃষ্টি করা। যেমন কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে:

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

তিনি তোমাদের জন্য গবাদী পশুর আটটি জোড়া নাযিল করেছেন। (আয যুমার ৬) । পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যায় তা যেহেতু আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়নি, আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসেছে। সুতরাং কুরআন মজীদে তা সৃষ্টি করাকে নাযিল করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী-রসূলদের মিশন কি তা বর্ণনা করার পর পরই আমি লোহা নাযিল করেছি, তার মধ্য বিপুল শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। বলায় আপনা থেকেই এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এখানে লোহা অর্থে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। বাক্যের প্রতিপাদ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু একটা পরিকল্পনা পেশ করার উদ্দেশ্যে রসূলদের পাঠান নাই। কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো ও সে উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করাও তাদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাতে এ প্রচেষ্টার ধ্বংস সাধনকারীদের শাস্তি দেয়া যায় এবং এর বিরুদ্ধে বাঁধা সৃষ্টিকারীদের শক্তি নির্মূল করা যায়।

অর্থাৎ আল্লাহ দুর্বল, তিনি আপন শক্তিতে এ কাজ করতে সক্ষম নন, তাই তাঁর সাহায্য প্রয়োজন, ব্যাপারটা তা নয়। তিনি মানুষকে পরীক্ষার জন্য এ কর্ম পন্থা গ্রহণ করেছেন। এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই মানুষ তার উন্নতি ও সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সব সময় এ ক্ষমতা আছে যে, যখন ইচ্ছা তিনি তাঁর একটি ইঙ্গিতেই সমস্ত কাফেরদের পরাস্ত করে তাদের ওপর তাঁর রসূলদের আধিপত্য দান করতে পারেন। কিন্তু তাতে রসূলদের ওপর ঈমান আনয়নকারীদের কি কৃতিত্ব থাকবে যে, তারা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? তাই আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে তাঁর বিজয়ী শক্তির সাহায্যে আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর রসূলদের 'বাইয়েনাত' স্পষ্ট নিদর্শনাদী, কিতাব ও মিযান দিয়ে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষের সামনে ন্যায়-নীতির বিধান পেশ করেন এবং জুলুম-নির্যাতন ও বে-ইনসাফী থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান। মানুষকে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, যার ইচ্ছা রসূলদের দাওয়াত কবুল করবে এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবে। যারা কবুল করলো তাদের আহবান জানিয়েছেন; এসো এই ন্যায় বিচারপূর্ণ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে আমার ও আমার রসূলদের সহযোগী হও এবং যারা জুলুম ও নির্যাতনমূলক বিধান টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করো। আল্লাহ তা'আলা এভাবে দেখতে চান, মানুষের মধ্যে কারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের বাণী প্রত্যাখ্যান করে আর কারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের মোকাবিলায় বে-ইনসাফী কায়েম রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ইনসাফের বাণী গ্রহণ করার পর তার সাহায্য-সহযোগিতা ও সে উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর কারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁরই কারণে এ ন্যায় ও সত্যকে বিজয়ী করার জন্য প্রাণ-সম্পদও বাজি রাখছে। যার পরীক্ষায় সফল হবে, ভবিষ্যতে তাদের জন্যই বহুবিধ উন্নতির পথ খুলে যাবে।

সুরা: আল-হাশর

আয়াত নং :-৮

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَۚ

(তাছাড়াও এ সম্পদ) সেই সব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ লোক।

তাফসীর :

এ কথা দ্বারা সেই সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা ঐ সময় মক্কা মুয়াযযামা ও আরবের অন্যান্য এলাকা থেকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বনী নাযীর গোত্রের এলাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত এসব মুহাজিরের জীবন যাপনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেসব অর্থ-সম্পদ এখন হস্তগত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেসব সম্পদ 'ফাই' হিসেবে হস্তগত হবে তাতে সাধারণ মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের সাথে সাথে এসব লোকেরও অধিকার আছে। উক্ত সম্পদ থেকে এমন সব লোকদের সহযোগিতা দেয়া উচিত যারা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং তাঁর দ্বীনের জন্য হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে এবং দারুল ইসলামে চলে এসেছে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ ﷺ বনী নাযীরের সম্পদের একটি অংশ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং আনসারগণ যেসব খেজুর বাগান তাদের মুহাজির ভাইদের সাহায্যের জন্য দিয়ে রেখেছিলেন তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, 'ফাই' এর সম্পদে মুহাজিরদের এ অংশ কেবল সেই যুগের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কিয়ামাত পর্যন্ত যত লোকই মুসলমান হওয়ার কারণে নির্বাসিত হয়ে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে তাদের পুনর্বাসিত করা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়া উক্ত রাষ্ট্রের ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই তার উচিত যাকাত ছাড়া 'ফাই' এর সম্পদও এ খাতে খরচ করা।

সর্বাস্থায়; নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এবং জান ও মালের মাধ্যমেও। যখনই যে সময়ে এবং যে অবস্থাতেই তোমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল দ্বীনের জন্য ডাক দেবেন, তখনই তোমরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বলবে, 'লাব্বায়িক' (আমরা হাজির)। যেভাবে ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যরা তাঁর ডাকে 'লাববায়িক' বলেছিলেন।

অর্থাৎ, যে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের নির্দেশ মহান আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, সেই দ্বীনের প্রচার-প্রসারের কাজে আমরা হব আপনার সাহায্যকারী। এইভাবে রসূল (সাঃ) হজ্জের মৌসুমে বলতেন, "কে আছে এমন যে আমাকে আশ্রয় দিবে, যাতে আমি মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিতে পারি। কারণ, কুরাইশরা আমাকে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে দিচ্ছে না।" নবী করীম (সাঃ)-এর এই ডাকে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে তাঁরা বায়আত করে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অনুরূপ তাঁরা তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যদি আপনি হিজরত করে মদীনায় আসেন, তবে আমরাই আপনার হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করছি। সুতরাং যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁরাই তাঁর এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গী-সাথীর পরিপূর্ণ সাহায্য করেছিলেন। এমন কি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সাঃ) তাঁদের নামই রেখে দিলেন, 'আনসার'। আর এই নামই তাঁদের পরিচয় হয়ে রইল। رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وأَرْضَاهُمْ (ইবনে কাসীর)

অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-কে প্রেরণ করে আমি এই শেষোক্ত ফির্কাটিকে অন্য ভ্রষ্ট ফির্কার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছি। তাই সঠিক আকীদার অধিকারী এই দলটি নবী (সাঃ)-এর উপরও ঈমান আনল। আর এইভাবে আমি দলীল-প্রমাণের দিক দিয়েও সমস্ত কাফেরদের উপর এদেরকে জয়যুক্ত করলাম এবং শক্তি ও রাজত্বের দিক দিয়েও। আর এই জয়ের সর্ব শেষ বিকাশ ঘটবে তখন, যখন কিয়ামতের পূর্বকালে ঈসা (আঃ) পুনরায়

পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। যেমন, এই অবতরণ ও বিজয়ের কথা স্পষ্টরূপে বহু সহীহ হাদীসে বহুধাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

আখেরাতের বিজয় সবচেয়ে বড় বিজয়।

আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সহযোগিতা করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সহযোগিতা করেন।

হকপন্থীরা সবর্দা জয়ী থাকবে, ইনশাআল্লাহ।